১৯শে মে এবং উত্তরকাল : ভাষা গণতন্ত্রের সংগ্রাম

ড. তাপস চট্টোপাধ্যায়

১৯৯৯ সন থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী,১৯৫২ উত্তরিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে। একুশের চেতনা আন্তর্জাতিকীকরণের আবেগে আমরা আপ্লুত। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী আসামের বাংলাভাষী অঞ্চল বরাক উপত্যকায় মাতৃভাষা বাংলার অধিকার দাবি করে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের কথা আমরা ক্বচিৎ স্মরণ করি ।

বাংলা ভাষার জন্য যিনিই শহিদ হোন না কেন, তিনি প্রত্যেক বাঙালির আদর্শ। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মবলিদান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়েছে । রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণার ফলে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা ও গুরুত্বে ঋদ্ধ। কিন্তু আসামের বরাক উপত্যকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী নাগরিকের মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে শিক্ষা ও সরকারি কাজে ব্যবহার করার জন্য আইনগত অধিকার রক্ষার দাবিতে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে শিলচরে ১৯৬১ সালের ১৯ মে প্রাণ দিতে হয় ১১জন ভাষাসংগ্রামীকে। এরপর ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট সেবা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন করিমগঞ্জের বিজন চক্রবর্তী।

এছাড়া ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলনে শহীদ হন করিমগঞ্জের আরো দুজন জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস। তিন দফায় পুলিশের গুলিতে মোট ১৫ জন শহীদ হন। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় এই শহীদরাও তো আমাদের ভাই-বোন। তাঁদের ভুলে যাওয়ার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন হচ্ছে ১৮৭৪-এর বঙ্গভঙ্গ আইন, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ কানুন এবং ১৯৪৭-এর দেশবিভাগর ঐতিহাসিক পরিণাম।

একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা সংগ্রাম থেকে বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমত, আসামে বাংলাভাষীরা বরাক উপত্যকায় সংখ্যাধিক হলেও আসাম রাজ্যে সংখ্যালঘু। পক্ষান্তরে, পূর্ববঙ্গের বাঙালির ছিল সমগ্র পাকিস্তানেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বরাকের

ভাষা আন্দোলন সংখ্যালঘুর আন্দোলন আর বাহান্নের ভাষা আন্দোলন সংখ্যাগুরুর আন্দোলন। ভারতীয় সংবিধানে বিভিন্ন সংখ্যালঘু ভাষিক জনগোষ্ঠীর যে অধিকার সংরক্ষণ করা হয়, সেটাই ছিল বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শক্তি। অর্থাৎ বরাকের ভাষা আন্দোলন আসামের ভূমিপুত্র ও পূর্ব পাকিস্থান থকে গত ছিন্নমূল উদ্বস্তু বাঙালির সংবিধান-স্বীকৃত অধিকার এবং একই সঙ্গে আসামের বহুভাষিক চরিত্র রক্ষার আন্দোলন।

বহুভাষিক আসাম রাজ্যের অসমিয়াকরণের প্রতিক্রিয়ায় ইতিমধ্যে আসাম ভেঙে কয়েকটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হওয়ায় বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের সঙ্গে অনসমিয়াভাষী গোষ্ঠীসমূহের যোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, আসামে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন। পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে) মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য একবারই শোণিত তর্পণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে, মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় এবং বাঙালির আত্মপরিচয় ও সামাজিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বরাক উপত্যকায় একাধিক বার রক্ত ঝড়েছে এবং মোট ১৫ জন বাংলা ভষার জন্য শহীদ হন। পররতীকলে আসম সরকার ভাষার অধিকার আইনবদ্ধ করা সত্বেও আসাম তথা বরাক উপত্যকার বাংলাভাষার রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। সময়ের সাথে ও সরকারি ভাষানীতির দাপটে বাংলা ভাষাও ক্ষীয়মান হয়ে চলছে।

বরাকের পনের জন ভাষাশহীদ সম্পর্কে এই প্রজন্মের পশ্চিমবঙ্গ তেমন কিছুই জানে বলে মনে হয় না। একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানেও বরাকের ভাষাশহীদদের নাম কেউ উচ্চারণ করে না। অথচ একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বরাকের বাঙালি। সেদিন বিশ্বের যেখানেই বাঙালি ছিলেন প্রত্যেকেই বাঙালির স্বাধীনতার সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এই অভূতপূর্ব ঐক্য রাজনীতির চোরাবালিতে হারিয়ে গেল কেন? বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামও নির্বাচনী রাজনীতির বেড়াজালে আটকে গেল।

পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন এবং বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় অভিন্নতা। প্রথমত,

দুটি আন্দোলনই সংগঠিত হয়েছিল বাংলা ভাষার উপর অন্য ভাষার ভাষিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত, দুটি আন্দোলনেই দলমত-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দুই ভূখণ্ডের বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রতিবাদী সংগ্রামে অংশ নিয়ে আত্মদান করেছিল অধিকার আদায় করতে গিয়ে। অন্যদিকে এ দুই আন্দোলনের মধ্যে আলাদা বিশিষ্টতাও ছিল। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষীর (৫৬%) উপর পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ (৭%) ভাষা উর্দুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আসামের বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙালির ভাষা অধিকার খর্ব করে তাদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের অসমিয়াকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে।

বরাক উপত্যকায় বসবাসরত বাঙালির যে ভাষা আন্দোলন তা আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের মতোই তা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল দেশবিভাগের সময় থেকে। অবশ্য সে প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্নতর। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার সময়ে শ্রীহট্টের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে মুসলিম অধ্যুষিত সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তখন প্রায় তিন লক্ষ চা-বাগান শ্রমিক — যাদের অধিকাংশই হিন্দু — আসামে আশ্রয় নেয়। অনেক অবস্থাপন্ন হিন্দু পরিবার সিলেট ছেড়ে আসামে উদ্বাস্তু হয়। এই সব বাঙালি আসামে হয়ে পড়ে সংখ্যালঘু। স্বাধীন ভারতে বহু জাতি ও বহু ভাষাগোষ্ঠী অধ্যুষিত আসাম রাজ্যে বাঙালিকে বিদেশী এবং বহিরাগত রূপে চিহ্নিত করার হীন অপপ্রয়াস শুরু হয়। আসামের প্রতি বাঙালিদের আনুগত্য নিয়ে সংশয়, সন্দেহ ও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে মহল বিশেষের উদ্যোগে প্ররোচনায়। এমনকি, অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে অন্তরায় হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। ‘আসাম শুধু অসমিয়াদের জন্য’ এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে সেখানে বাঙালির অধিকার হরণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলতে থাকে। শুরু হয় বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে অসমিয়াকরণের প্রয়াস। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অসমিয়া ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে প্রবর্তনের নির্দেশ

দেওয়া হয় এবং অন্যথায় তাদের অনুদান বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে সেখানে ২৫০টি বাংলা মাধ্যমের স্কুলের মধ্যে ২৪৭টিই বন্ধ হয়ে যায়। এককথায় ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে ভাষা, শিক্ষা, নিয়োগ, এমনকি ভূমি বণ্টন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আসাম সরকারের নীতি-অবস্থান হয়ে দাঁড়ায় বাস্তবে অনসমিয়া তথা বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি উপেক্ষা, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক। এই প্রেক্ষাপটেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র এলাকায় শুরু হয় ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং সেই সঙ্গে উৎপীড়ন ও দাঙ্গা।

আসামের বিধানসভাতেও অসমিয়াকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বিধানসভায় অনসমিয়াদের জন্য বাংলা, ইংরেজি কিংবা হিন্দি ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনের বিধান ছিল। ঐ বছর নতুন আইন পাশ করে তা কেড়ে নেওয়া হয়। তবে ঐ বিধানে তখনও অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে মাতৃভাষায় বক্তব্য পেশের সুযোগ ছিল। কিন্তু ১৯৫৩ সালে বিধানসভায় একমাত্র অসমিয়াকে রাজ্যের ভাষা হিসাব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তাতে আসাম রাজ্যের সর্বত্র অনসমিয়া ভাষীদের মধ্যে বিতর্ক ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অবশ্য বেসরকারিভাবে উত্থাপিত ঐ প্রস্তাব তখন বিবেচনা না করে স্থগিত রাখা হয়।

ভাষা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে ১৯৬০-এর এপ্রিলে। ২১ ও ২২ এপ্রিল আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সভায় অসমিয়াকে আসামের একমাত্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর পর পরই আসাম প্রদেশের শাসকবর্গ উগ্র ভাষাপ্রেমের পক্ষে অবস্থান নেন এবং অসমিয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা করার অপচেষ্টায় সক্রিয় তৎপরতা শুরু করেন। এর ফলে অনসমিয়া বিশেষত বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং সরকারি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে ২১ জুন ১৯৬০ শিলচরে ‘নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন’-এর উদ্যোগে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভা সদস্য দ্বারিকানাথ তেওয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় আলতাফ হোসেন মজুমদার, নন্দকিশোর সিংহ, নিবারণচন্দ্র লস্কর, রথীন্দ্রনাথ সেন, গোলাম ছগির খান, শরৎচন্দ্রনাথ

বসু প্রমুখ বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং প্রতিবাদ জানান। সভায় অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার আন্দোলনের নামে বাঙালিদের উপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করা হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনকে সংহত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে ২ ও ৩ জুলাই ১৯৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন'। এই সম্মেলনে আসাম রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পঁচিশ হাজার নরনারী সমবেত হন। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্মেলন পরিণত হয় মহাসম্মেলনে। সভায় আসামের সরকারি ভাষা হিসেবে একমাত্র অসমিয়ার প্রবর্তন স্থগিত রেখে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পরই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাব্যাপী শুরু হয় দাঙ্গা হাঙ্গামা। অসমিয়াপন্থী উগ্র দাঙ্গাবাজরা পথে নামে। নির্বিচারে বহু বাঙালির বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। লুঠতরাজ, হত্যা ও ধর্ষণ চলে অসমিয়া ভাষা আন্দোলনের নামে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্ব এতে পরোক্ষভাবে মদত জোগায়। প্রশাসনের এক শ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্তাব্যক্তি ও পুলিশ কর্মকর্তা এসব ঘটনায় নেপথ্যে ইন্ধন জোগান। ১৯৬০ সালের এপ্রিলে, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে অসমীয়া ভাষাকে প্রদেশের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার একটি প্রস্তাবের সূচনা হয়। এতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। অসমীয়া উত্তেজিত জনতা বাঙালি অধিবাসীদের আক্রমণ করে। জুলাই ও সেপ্টেম্বরে সহিংসতা যখন উচ্চ রূপ নেয়, তখন প্রায় ৫০,০০০ বাঙালি হিন্দু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যায়। অন্য ৯০,০০০ বরাক উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বের অন্যত্র পালিয়ে যায়। ন্যায়াধীশ গোপাল মেহরোত্রার নেতৃত্বে এক ব্যক্তির একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কামরূপ জেলার গোরেশ্বর অঞ্চলের ২৫টি গ্রামের ৪,০১৯টি কুঁড়েঘর এবং ৫৮টি বাড়ি ধ্বংস ও আক্রমণ করা হয়; এই জেলা ছিল সহিংসতার সবচেয়ে আক্রান্ত এলাকা। নয়জন বাঙালিকে হত্যা করা হয় এবং শতাধিক লোক আহত হয়। ১০ অক্টোবর, ১৯৬০ সালের সেই সময়ের অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা অসমীয়াকে আসামের একমাত্র

সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উত্তর করিমগঞ্জ-এর বিধায়ক রণেন্দ্রমোহন দাস এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

১০ অক্টোবর, ১৯৬০ আসাম বিধান পরিষদে আসাম সরকারি রাজ্যভাষা বিল উত্থাপন করা হয়। ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত এ বিল নিয়ে আলোচনা চলে। ২৪ অক্টোবর সকল সংশোধনী প্রস্তাব, অনুরোধ-নিবেদন উপেক্ষা করে রাজ্যভাষা বিল চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এভাবে আসামের বিভিন্ন অসমিয়া উপজাতি গোষ্ঠী ও দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী লক্ষ লক্ষ বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার দাবি উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত হয়। এর প্রতিবাদে অনেক সংসদ সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। মাতৃভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষোভে, দুঃখে, উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। ১৯৬০-এর ৬ ও ৯ নভেম্বর নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সম্মেলনের উদ্যোগে কনভেনশন আহ্বান করা হয়। কনভেনশন সংবিধান স্বীকৃত ভাষা-অধিকার সুরক্ষা করা ও মাতৃভাষার স্বীকৃতি আদায় সহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমেই সংহত রূপ নিতে থাকে। ১৯৬০-এর ১৮-২০ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কাছাড় উপত্যকা তথা বরাক উপত্যকার বাঙালি নাথ যুগী সম্প্রদায়ের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন। ঐ অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অসমিয়া ভাষার মতো সরকারি মর্যাদা দেওয়া না হলে বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চল আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় কাছাড় জেলা জনসম্মেলন। সম্মেলনে বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা করার দাবি তোলা হয়। অন্যথায় সমগ্র জেলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৪ এপ্রিল ১৯৬১ নববর্ষের দিনে কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পালিত হয় ‘সংকল্প দিবস’। সংকল্প করা হয় মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার। এই সংকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হিসাবে ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয় পদযাত্রা। দুই সপ্তাহ ধরে পদযাত্রীরা ২২৫

মাইল পথ অতিক্রম করেন। গ্রামে গ্রামে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালান। ২ মে তাঁরা করিমগঞ্জে এসে পৌঁছলে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯ মে ভাষা আন্দোলনের অংশ হিসাবে কাছাড় জেলার সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। আগের রাতে করিমগঞ্জে সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয়ে চলে পুলিশি হামলা। আন্দোলন ঠেকাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করা হয় অনেক নেতা-কর্মীকে। সে খবর দাবানলের মতো রাতেই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। শহর জেগে ওঠে উত্তেজনায়। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে জনতা নামে রাজপথে।

১৯ মে ভোর চারটায় শিলচর রেল স্টেশনে শুরু হয় সত্যাগ্রহীদের অবরোধ। জেলার সর্বত্র একই সময় থেকে সর্বাত্মক ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। দোকানপাট যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। কোর্ট-কাছারি, ডাকঘর, অফিস-আদালত সব কার্যালয়ের সামনে চলে পিকেটিং। গ্রেফতার বরণ করেন হাজার হাজার কর্মী। আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে শাসকগোষ্ঠী মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য তারা বেছে নেয় চরম নির্যাতনের পথ। ঐ দিন দুপুর আড়াইটায় শিলচর রেল স্টেশনে তারা ধর্মঘটরত জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। শত শত লোক আহত হয়। গুলিতে শহীদ হন ১১ জন। এঁরা হলেন : শচীন্দ্র পাল, কানাই নিয়োগী, কমলা ভট্টাচার্য, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, কুমুদ দাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর ও সত্যেন্দ্র দেব। এরপর ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট সেবা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন করিমগঞ্জের বিজন চক্রবর্তী এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলনে শহীদ হন করিমগঞ্জের আরো দুজন জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস।

১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠীর উগ্র ভাষানীতির মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন করে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার [প্রমুখ], তেমনিভাবে ভাষা আন্দোলনের আর এক ইতিহাস রচিত হল বরাক উপত্যকায়। তাতে খচিত হল ১১ জন ও পরে অন্য দুটি প্রতিবাদি ঘটনায় আরো চার জন শহীদের নাম।

এই ঘটনায় সারা ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ২১ মে শিলচর সহ সমগ্র কাছাড় জেলায় রেলকর্মীরা কর্মবিরতি পালন করেন। শিলংয়ে বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন শোক পালন করে। শোক পালিত হয় জলপাইগুড়িতে। কলকাতায় তীব্র প্রতিবাদ ওঠে সভা, সমিতি, মিছিলে। শহীদ স্মরণে শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ২৩ মে গৌহাটি, শিলং, জাফলং, আইজল ও আগরতলায় পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস। বিভিন্ন বাম দল সম্মিলিতভাবে ২৪ মে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পালন করে প্রতিবাদ দিবস। ২৪ মে বরাকের বুকে বিশ হাজার সত্যাগ্রহী আসাম সরকারের বিদ্বেষনীতির বিরুদ্ধে আমরণ সত্যাগ্রহের শপথ নেয়। ২৬ মে ঈদ উৎসবের দিন বরাক উপত্যকার সর্বত্র ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে হত্যাকাণ্ডের নীরব প্রতিবাদে সামিল হয়। ২৯ মে পালিত হয় ভাষা শহীদ তর্পণ দিবস। শহীদের চিতাভস্ম নিয়ে অজস্র জনতা সামিল হয় মৌনমিছিলে।

এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

কালের যাত্রার ধ্বনি সবাই শুনতে পান না: অস্বস্তিকর এই সত্য মেনে নিতে হয়। আত্মবিস্মৃতির আয়োজন আঞ্চলিক-জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে এত নির্বাধ যে মেকি ইংরেজিয়ানা ও মোটা দাগের হিন্দিয়ানা, বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মকে, প্রায়-সম্পূর্ণ অনিকেত করে দিয়েছে। ব্যক্তি-জীবন ও সামাজিক অস্তিত্ব থেকে ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা নিঃশেষে মুছে দিয়ে আমরা এখন বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী ভোগবাদ ও পণ্যদেববাদের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছি। ১৯ মে-র এগারো জন শহিদের বুক-মাথা ফুটো-করে দেওয়া বলেটের হিংস্র শিস আমরা কেউ শুনতে পাই না। শুনতে পাই না ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট ও ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই তারিখে শহিদ হওয়া আরও তিনজন মৃত্যুজিৎ তরুণের বার্তা। দেখতেও পাই না কোথায় অন্ধকারের শুরু আর কোথায় শেষ। আমরা বধির, আমরা অন্ধ। আমরা সেই জগদ্দল পাথর, সময়-শৈবাল যাদের ঢেকে দিয়েছে। তারিখ কি কেবলই তারিখ, ক্যালেণ্ডার থেকে ঝরে—যাওয়া যে-কোনো একটি পাতা?

‘মনে হয় অজন্ম মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম আজি নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়’—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এরকমও বলা কঠিন। যদিও গত কয়েক বছরে বরাক উপত্যকায় ১৯ মে যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে পালিত হচ্ছে এবং অন্তত কয়েক বছর ধরে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্য দু-তিনটে জেলা শহরে এদিন কিছু কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে—তবু বলা যায়, ১৯-এর চেতনা আজও প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। পায়নি কারণ দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো অবসর বাঙালি বুদ্ধিজীবীর আজও হয়নি। আসলে ইতিহাসও মূলত এক প্রতিবেদন যাকে অনুভূতি দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে অধ্যবসায় দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। ইতিহাসের কাছে তেমন কোনও দায় বোধ করিনি বলেই এই সেদিন পর্যন্ত স্বরচিত হিম নীরবতার দুর্গে স্বেচ্ছাবন্দী ছিলাম আমরা।

শুধু বরাক উপত্যকার জন্যে নয় উনিশে, যেমন একুশ ফেব্রুয়ারি নয় কেবল বাংলাদেশের। উনিশের চেতনা নয় মৃণালভোজী সম্প্রদায়ের জন্যেও। ভালো বাঙালি হওয়ার জন্যেই উনিশে মে আমাদের জীবনের নবীন যাত্রা রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করুক, নিয়ে যাক রূপ থেকে রুপান্তরে, প্রবল থেকে প্রবলতর উদ্ভাসনে। ভালো বাঙালি যে হতে পারেনি, ভালো ভারতীয়ও সে হতে পারবে না কখনও—ভালো মানুষও নয়। কেননা মৌলবাদের হিংস্র দাপট ও অজস্র প্ররোচনা সত্ত্বেও অবিচল থাকে যে বাঙালিরা, উনিশের চেতনা তাদের ঘিরেই পুষ্পিত হয়। চর্যাপদের যুগে আমাদের জাতীয় চেতনার যে অভিজ্ঞান নীর্ণিত হয়েছিল, সেই প্রতিবাদী মনন ও বোধ পুনরুজ্জীবিত করে একুশে ফেব্রুয়ারি আর উনিশে মে। উনিশের চেতনার তাৎপর্য হল অপরাজেয় মানবিক পরিসর পুনরাবিষ্কার।